পুঁথিপাঠ: গ্রামীণ জীবনের গল্পকথার ঐতিহ্য

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ

এক সময় বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে গল্প বলার সংস্কৃতি ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তখন টেলিভিশন, মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট- এসব কিছুই ছিল না। সেই সময়ে গ্রামের মানুষ দিনশেষে উঠোনে, গাছতলায় বা পাঠশালার ছায়াঘেরা বারান্দায় জড়ো হতো। সেখানে তারা শুধু গল্পই শুনত না—শুনত ছন্দে বাঁধা, কবিতার মতো লেখা বিশেষ ধরনের কাহিনি, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুখে মুখে প্রচারিত হতো। এই গল্প বলা বা আবৃত্তির ঐতিহ্যকে বলা হতো পুঁথিপাঠ, যা এক সময় ছিল আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় চর্চা।

পুঁথিপাঠ কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিলনা; এটি ছিল শিক্ষা, ধর্মীয় উপদেশ, নৈতিকতা এবং সামাজিক মুল্যবোধ শেখার অন্যতম পথ। যখন গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের বই পড়ার সুযোগ ছিল না কিংবা স্কুলে যাওয়ার সাধ্য ছিল না, তাঁদের জন্য এই পুঁথিগুলো জ্ঞান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ খুলে দিত। পুঁথিপাঠ শুধু একটি ব্যক্তিকে নয়, বরং সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করত, মানুষকে শিক্ষিত করত এবং একটি সম্মিলিত মানস গঠনে ভূমিকা রাখত।

পুঁথিপাঠে যেসব গল্প বলা হতো, সেগুলো অনেক ধরনের উৎস থেকে নেওয়া হতো। কিছু ছিল ধর্মীয় কাহিনি, আবার কিছু ছিল প্রেমের গল্প—ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের করুণ উপাখ্যান। অনেক পুঁথিতে থাকত নৈতিক শিক্ষা—সততা, দয়া, ধর্মভীরুতা ইত্যাদি গুণাবলির কথা। অন্যদিকে, কিছু পুঁথি ছিল হাস্যরসাত্মক ও লোকজ গল্প, যেগুলোতে গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটত। পুঁথির কাহিনি লেখা হতো একধরণের দোভাষী বাংলা ভাষায়। এতে বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবি ও ফারসি শব্দের মিশ্রণ থাকত। এই ভাষাশৈলী কাব্যিক ও সমৃদ্ধ। তবে, আজকের বাংলাভাষীদের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য।

পুঁথি নামে পরিচিত যেসব পাণ্ডুলিপি থেকে এই গল্পগুলো আবৃত্তি করা হতো, সেগুলো সাধারণত হাতে লেখা হতো। কোনোটি তালপাতায়, চামড়া কিংবা ভুজপাতায় আবার কোনোটি নিজ হাতে তৈরি কাগজে লেখা থাকতো। আবার পরবর্তীতে ছাপা কাগজেও কিছু পুঁথি দেখা গেছে। কিছু পুঁথি ছিল একেবারে সরল, আবার কিছু ছিল অত্যন্ত শৈল্পিক—সুন্দর সীমানা ও ক্যালিগ্রাফিতে সাজানো। কিন্তু পুঁথির আসল সৌন্দর্য ছিল সেটি পাঠ করার ভঙ্গিতে। এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ পারফরম্যান্স। যারা পুঁথি পাঠ করতেন, তাঁদের বলা হতো পাঠক। তাঁরা ছন্দে, সুরে ও তাল মিলিয়ে এই গল্পগুলো এমনভাবে পড়তেন, যেন একটি সংগীত পরিবেশন হচ্ছে। শুধু গল্প নয়, সেই সুর ও আবেগময় পরিবেশন ছিল আসল আকর্ষণ। তার কণ্ঠের ওঠানামা, আবেগ, থেমে থেমে পড়া—সবকিছু মিলে একটি আকর্ষণীয় আবৃত্তি হয়ে উঠত।

পুঁথিপাঠ একটানা কয়েক ঘণ্টা বা কখনো কয়েকদিন ধরে চলতো। অনেক সময় মেলা, ধর্মীয় উৎসব বা শীতের সন্ধ্যায় পুঁথিপাঠের আয়োজন হতো। মানুষ সময় বের করে একত্র হতো শোনার জন্য। তখনকার গ্রামীণ সমাজে এছিল এক বড় সামাজিক উৎসবে।

জানা যায়, পুঁথিপাঠ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বরিশাল ও সিলেট অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে অনেক নামকরা পুঁথি পাঠকের জন্ম হয়েছে। অনেকে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুঁথিপাঠ শিখতেন, আবার অনেকেই পারিবারিকভাবে শিখতেন। অনেকে ছোটবেলায় পুঁথি শুনতে শুনতে মুখস্থ করতেন, তারপর নিজেরাই ছোট পরিসরে পাঠ করতেন। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। একজন দক্ষ পাঠক শুধু ভালো পাঠ করতে পারতেন না, তাঁর স্মরণশক্তি, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকত, যা মানুষকে গল্পে ডুবিয়ে দিত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিপাঠের এই ঐতিহ্য এখন প্রায় হারিয়ে গেছে। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এই শব্দটাই কখনো শোনেনি। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার পুঁথিপাঠকে সরিয়ে দিয়েছে। যখন প্রথাগত স্কুলে পড়াশোনার চর্চা বাড়তে লাগল এবং পাঠ্যবইভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলো, তখন দোভাষী ভাষায় লেখা পুঁথিগুলো পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিষয় হিসেবে ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে থাকে। নতুন প্রজন্মের কাছে এসব ভাষা অপরিচিত ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত, গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তর, অর্থাৎ আধুনিক নগরায়ণ, গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে। একসময় যে উঠোনে, গাছতলায় বা চাতালে মানুষ গল্প শুনতে জড়ো হতো, সেই জায়গাগুলো এখন খালি পড়ে থাকে। শহরে ব্যস্ত জীবনে এসবের কোনো জায়গা নেই।

তৃতীয়ত, ডিজিটাল বিনোদনের প্রভাব পুঁথিপাঠের মতো ধৈর্য-নির্ভর সংস্কৃতিকে এখন অনেকটা অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। এখনকার মানুষ টিকটক, ইউটিউব বা ফেসবুকে ১৫-৩০ সেকেন্ডের ভিডিও দেখে অভ্যস্ত। দীর্ঘ সময় বসে গল্প শোনার ধৈর্য বা ইচ্ছা অনেকের মধ্যে নেই। তাছাড়া, পুঁথিপাঠ শেখানোর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই, উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার বা অনুদান নেই। ফলে এই শিল্পে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ গড়ে উঠছে না।

যেসব পাঠক এখনও বেঁচে আছেন, তাঁরা বয়সে প্রবীণ। অনেকেই এখন আর পারফর্ম করছেন না। তারা শুধু পুরোনো দিনের সেই স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন, যখন মানুষ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁদের গল্প খুব মনোযোগ দিয়ে শুনত। এখন সেই শ্রোতা নেই, আগ্রহও নেই। চর্চার অভাবে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

তবে এখনো কিছুটা আশার আলো আছে। এখন পুঁথিপাঠের পরিবেশনা প্রায় না থাকলেও, অনেক পুঁথি বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পরিবারে এবং গ্রন্থাগারে বহু পুঁথি রয়ে গেছে। কিছু ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, আবার অনেক পুঁথি অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে - আর্দ্রতা, পোকার আক্রমণ আর অবহেলার কারণে। এই পুঁথিগুলো কেবল গল্প নয়, এগুলো ইতিহাস যেখান থেকে জানা যায় কীভাবে এক সময় মানুষ চিন্তা করত, কীভাবে তারা জীবনযাপন করত।

বাংলাদেশের কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান পুঁথি পাণ্ডুলিপিগুলো সংরক্ষণের কাজ করছে। বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, এশিয়াটিক সোসাইটি এই কাজে এগিয়ে এসেছে। তারা পুঁথি ডিজিটাইজ করছে এবং গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করছে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা পুঁথিগুলো বাংলায় রূপান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলা একাডেমি। পুথিগুলো ডিজিটাল করার ফলে এখন কম্পিউটার বা মোবাইলে পুঁথিপড়া সম্ভব হবে। এভাবে বহু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। গবেষকরা বলছেন, এই পুঁথিগুলোর সাহিত্যিক মূল্যই শুধু নয়, এগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায় অতীতকালে গ্রামীণ সমাজ ধর্ম, নৈতিকতা ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে কী ভাবত।

ক্ষীণভাবে হলেও পুঁথিপাঠ পরিবেশনের দিকটিও রক্ষা করার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব বা আয়োজনে পুঁথিপাঠের পরিবেশনা করা হয়। আবার কিছু গবেষক ও এনজিও মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন। তারা প্রবীণ পাঠকদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তাদের পাঠ ভিডিও রেকর্ড করছেন, সংরক্ষণ করছেন। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় প্রবীণ পুঁথি পাঠকের পাঠ রেকর্ড করা হচ্ছে। এসব রেকর্ড হয়তো পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

বাস্তবতা হলো, বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে মিল রেখে পুঁথিপাঠকে পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন। কারণ, শুধু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করলেই হবে না, পাঠক তৈরি করতে হবে, শ্রোতা তৈরি করতে হবে - যারা ছন্দে, সুরে, ধৈর্য নিয়ে গল্প শুনতে আগ্রহী। বর্তমান ব্যস্ত জীবনে এটা বড় চ্যালেঞ্জ। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, না হলে এটি শুধু ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

তবুও এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ, সংস্কৃতি মানে কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, এটি আমাদের পরিচয়, আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ। পুঁথিপাঠ বাংলাদেশের অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেগুলোর একটি। এটি সেই সময়ের কথা বলে, যখন গল্প ছিল শেখার মাধ্যম, যখন মানুষ একসঙ্গে বসে শুনত, শিখত এবং ভাবত। এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের প্রচেষ্টা, এমনকি ছোট পরিসরে হলেও সেটি ভবিষ্যতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। পুঁথি সংরক্ষণ, পাঠ রেকর্ডিং, কিংবা স্কুল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি উদ্যোগ পুঁথিপাঠের স্মৃতি আমাদের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আমরা হয়তো পুরোনো দিনের মতো এটিকে পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে পারব না, কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গৌরবময় অংশ হিসেবে একে সম্মান জানাতে পারি।

পুঁথিপাঠ শুধু গল্প নয়। এটি গল্প বলার মাধ্যমে তৈরি হওয়া সম্পর্ক, অভিজ্ঞতা ও ভাবনার সেতু। এটি আমাদের শেখায় কণ্ঠস্বর, ছন্দ, ভাষা ও অনুভব কীভাবে মানুষকে যুক্ত করতে পারে। ডিজিটাল যুগের সম্ভাবনা ধরে আমরা প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে আমাদের শিকড় ঐতিহ্যও ভুলে গেলে চলবে না। একদিন ভবিষ্যতের প্রজন্মও জানবে- বাংলার এক সময় ছিল, যখন গল্প বলা ছিল শিল্প, শোনা ছিল অভ্যাস আর সমাজের মেলবন্ধন ঘটত শব্দ আর ছন্দের মাধ্যমে।

#

লেখক: পরিচালক (মিডিয়া), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পিআইডি ফিচার